রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকেআমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলিছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকুবলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কারহওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তি-যুক্ত কারণ তখনবা আজ কোনোদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমিখালাস; তাহারা যদি সে রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্টআনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখনমাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাঙলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লী আর চোখে ভাল লাগে না।একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বিভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিতসর্বশেষ সারির বাড়িগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরচি বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদি, ছোটবড় শিলাখণ্ড ও ভেলা কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া একজায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দু'টি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালি। একটাকথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানেএতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁইকিয়দংশ ধসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ওচারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য-আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙামন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়,—অনুভূতিটা ভয়ের।ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল, একথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটা ভাল করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়াবলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে..."

"কেন?"

"জায়গাটা ভাল না। সাপের ভয় আছে সন্ধেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণীদেবীর মন্দির, স্যার। কিন্তু আমাদের গায়ের বুড়ো লোকেরাও কোনোদিনওখানে পুজো হতে দেখেনি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদেরবাপ-ঠাকুরদাদার আমলেরও আগে থেকে।...চলুন স্যার নামি!"

ছেলেদুটো যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণীদেবী বা তাহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নওকরিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন; আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে-বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এঅঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিনহইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড়মেলা বসে। বি-এন-আর লাইনের একটা ছোটো স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়াগেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামের চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহারমুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবংএই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়িতে গিয়াযে হানা দিয়েছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব আরণ্য অঞ্চল সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি! কলিকাতার বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়!

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখেচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণীদেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিনসন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস করেচি সেই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণীর দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো—তাদের দেবতা উনি। ইদানীংহিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণীর মন্দিরে নরবলি হয়েছে।অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েছে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"

‘রঙ্কিণীদেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে ?”

“না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়অন্য কোন দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইতবংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তার বাড়ি ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসিতখন তাঁর বাড়ি অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়া কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাইনি—বয়েসহয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুইনে।”

‘বিগ্রহের মূর্তি কি?”

“শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকত অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েছে তার লেখা-জোখা নেই—এখনো মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটাঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।”

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়। শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথেআমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরো বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে হয়তোসেখানে আরো অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালিদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্যে বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিলকমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এইসময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্যছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়ি সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনো আমার বাসায় আসেন নাই; বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়াবিস্ময়ের সুরে বলিলেন, “এই বাড়িতে থাকেন আপনি?”

বলিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরেথাকতাম। বছর খানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।”

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটাসরু যাতায়াতের বারান্দা।জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ির একটু চুনবালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়িটার গড়ন তাহার ভাল লাগিয়াছে, বলিলাম, “সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের!”

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, “না, সেজন্যে নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়িই হল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আরকেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরেবাড়িটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হলপ্রায় ষাট।” তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়িতে গিয়াউঠিলেন।

আরো বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনোযাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালি-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক, বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে, এ কয়দিনস্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এঃ বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজার চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে!

আমি তো অবাক! কিসের রক্তের ধারা এ? কোথা হইতেই বা আসিল! আজ দু'দিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্যতাজা রক্ত!

অবশ্যকুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকেবলিলাম, "দেখ তোরে, রক্তটা কোন দিকে যাচ্চে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণঅন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনোদিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপারকিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালেরব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়!

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেলঘরটায় পুরনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরাসড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতিতে ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কিবাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগল..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটা হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়াউঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম-দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টক্‌টকে রাঙা। একটু-আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়াপড়িবে!

সেই মুহূর্তে একসঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরানো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো।...মড়কেরআগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাইনাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমেজয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধূলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় রইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম। তারপর আরকখনো চেরোতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিণীদেবীকে মনে মনে ভক্তি করি! তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়াসকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুলবোঝে।